আমি এবং রুমি

শামস-ই-তাবরিজী'র আত্মজীবনী

উইলিয়াম সি চিতিক

অনুবাদ
আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

অনুবাদকের উৎসর্গ

গোলাম মাওলা রনি
(সাবেক সংসদ-সদস্য)

অনুবাদকের ভূমিকা

প্রফেসর উইলিয়াম সি চিতিক সুফিবাদের প্রবাদপুরুষ শামস-ই-তাবরিজী রচিত ‘মাকালাত-ই-শামসি তাবরিজী’র (শামস-ই-তাবরিজী’র সংলাপ) ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে গ্রন্থটিকে শামসের আত্মজীবনীর রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বইটির নাম দিয়েছেন ‘মি অ্যান্ড রুমি : দি অটোবায়োগ্রাফি অফ শামস-ই-তাবরিজী’। প্রচলিত অর্থে এটি কোনো আত্মজীবনী নয়। চিতিক শামসের বক্তব্যগুলোকে তাঁর কথোপকথনের স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে সজ্জিত করেছেন, যাতে পাঠকরা তাঁর জীবন সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পেতে পারেন।

সুফিবাদের সাথে শামস-ই-তাবরিজী’র নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুফিবাদের রহস্য পুরুষ তিনি। শামসের জীবনের লক্ষ্য ছিল পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ম-রীতির ঊর্ধ্বে উঠে আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। জীবনের ষাট বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও তিনি নিজের পরিবার গড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করেননি। জালালুদ্দীন রুমির সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাদের দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠা গভীর আত্মিক সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী হলেও তা ছিল রুমির জীবনকে বদলে দেওয়ার সূচক। রুমি তাঁকে নিজের বলয়ে আটকে রাখার নানা চেষ্টা করলেও শামস খাঁচায় আবদ্ধ থাকার পাখি ছিলেন না। তিনি বিচরণের মধ্যে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। রুমির কাছে শামস এত গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন কেন? সকলেই স্বীকার করেন যে, রুমির জীবনে শামসের আবির্ভাব না হলে তাঁর কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটত না। যে কারণে সংসারত্যাগী ভবঘুরে দরবেশকে রুমি উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। রুমির কবিতার ছত্রে ছত্রে তিনি শামসের মহত্ত্ব, শামসের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর হৃদয়ে যে যাতনা ভোগ করেছেন তা তুলে ধরেছেন এবং রুমীর কবিতার মধ্য দিয়েই শামস তাবরিজী অমরত্ব লাভ করেছেন। ‘দিওয়ান-ই-শামসি তাবরিজী’র একটি কবিতায় রুমি বলেছেন, “ও শামসি তাবরিজ, তুমি তো দিগন্তের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত, তোমার হৃদয় ও আত্মার কাছে কোনো বাদশাহও ভিখারি ছাড়া কিছু নয়।” আরেকটি কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন, “শামস তাবরিজী’র রাজকীয় ক্ষমতা ছাড়া কারো পক্ষে চাঁদকে ধরা বা সাগরে পরিণত হওয়া অসম্ভব।”

‘মাকালাত-ই-শামসি তাবরিজী’ একটি গদ্য সংকলন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি এগুলো লিখেছেন অথবা কথাগুলো বলেছেন, যা তাঁর ভক্ত অনুরক্তরা তা টুকে

রেখেছিলেন। ‘মাকালাত’ মূলত ইসলামের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এবং আধ্যাত্মিক উপদেশের সংকলন। কিন্তু তাঁর কথায় মানুষের জীবনের সবকিছুই উঠে এসেছে। কুরআনের আয়াত ও হাদিসের উদ্ধৃতি, জ্ঞানী ব্যক্তিদের বাণী, প্রকৃত ও ভুয়া দরবেশ, আত্মপ্রেম, প্রকৃতি, মহাজগৎ, বেহেশত ও হুর, নারী পুরুষের প্রেম ও দৈহিক সম্পর্ক, সমকাম, মদ ও গাঁজা সেবন ইত্যাদি ছাড়াও বহু তুচ্ছ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। অশ্লীল কথা এবং গালিগালাজও বাদ পড়েনি। আধ্যাত্মিকতা যেহেতু জীবন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, অতএব জীবন-সম্পৃক্ত সবকিছু নিয়েই শামস-ই-তাবরিজী’র ‘মাকালাত’ বা ‘সংলাপ’। গ্রন্থটিতে পাঠকরা আত্মোন্নয়নের খোরাক পাবেন বলে বিশ্বাস করি।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
নিউইয়র্ক, মে ৩, ২০২০

ইংরেজি অনুবাদকের ভূমিকা

জালালুদ্দীন রুমী পাশ্চাত্যের পাঠকদের কাছে এত জনপ্রিয় ও খ্যাতির অধিকারী হয়ে উঠেছেন যে, তাঁকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। রুমীর সাথে পরিচিত হয়ে ওঠা যে-কেউ কমপক্ষে তাঁর সঙ্গী তাবরিজের শামস-উদ-দীন এর নাম জানেন, যিনি শামস-ই-তাবরিজ নামেই বেশি পরিচিত। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক কতটা নিবিড় থাকলে হিউস্টন স্মিথ এর মতো পণ্ডিত তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ "হোয়াই রিলিজিয়ন ম্যাটারস" গ্রন্থে শামসের জন্য রুমির ভালোবাসাকে একটি বাক্যে বিট্রিস-এর জন্য দান্তের ভালোবাসার সাথে তুলনা করেছেন।

রুমির কবিতায় শামসের কথা বারবার এসেছে এবং তাঁর বিবরণী ও পরবর্তী সাহিত্যেও শামস সম্পর্কে উল্লেখ পর্যাপ্ত। কিন্তু শুরু থেকেই তাদের প্রকৃত সম্পর্কের ধরন প্রায় প্রত্যেককেই বিস্মিত করে। যিনি প্রচলিত সকল বিচার-বিশ্লেষণে একজন মহান ও সফল বিদ্বজ্জন— হঠাৎ তাঁকে ঐতিহ্য ও রীতিপ্রথা দ্বারা পরিচালিত একটি সমাজের অনুমোদনের জন্য নিক্ষেপ করা হলে বিষয়টিকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? এছাড়া আমরা প্রায় সুনির্দিষ্টভাবে এমন কারও সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে শুরু করি, যাকে দৃশ্যত ইতর-জন বলে মনে হয়। শামস কী ধরনের ব্যক্তি ছিলেন, যার পক্ষে একজন ব্যতিক্রমী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, কবি এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষকের ওপর এত গভীর প্রভাব ফেলা সম্ভব হয়েছিল? রুমি সম্পর্কে যারাই লিখেছেন, তাঁর পুত্র ও মুরিদদের থেকে শুরু করে সকলেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল। আমরা যা শুনিনি তা হলো, কাহিনি সম্পর্কে শামসের নিজস্ব ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ সেই শূন্যতা পূরণ করবে।

রুমিই শামসকে কল্পতুল্য বাতাবরণ দিয়েছেন। স্মরণ করুন, রুমির দীর্ঘতম কাজ তাঁর ২৫,০০০ লাইনবিশিষ্ট ছয় খণ্ডের আধ্যাত্মিক মহাকাব্য 'মসনবি' নয়; বরং তাঁর ৪০,০০০ (মতান্তরে ৬৪ হাজার) লাইনের কবিতা সংকলন, তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রেমের কবিতা, যা 'দিওয়ান-ই শামস-ই তাবরিজী' নামে পরিচিত। যদিও প্রেমের এই বিশাল স্তবগ্রন্থ শামসের নাম ধারণ করে আছে, কিন্তু কেউই কখনো ভাবেননি যে, তিনি এই কবিতাগুলোর রচয়িতা। সংকলনটি তাঁর নামেই হয়েছে, কারণ রুমি স্বয়ং নিজেকে শামসের মাঝে বিলীন করেছেন এবং তাঁকে ভক্তি প্রদর্শনের প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত বস্তুতে পরিণত করেছেন। 'দিওয়ান-ই-শামস' অবশ্যই ঈশ্বরের জন্য প্রেম সম্পর্কিত; কিন্তু প্রেমের যাতনা ও আনন্দকে রুমি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেখানে

শামস শুধু একজন মানুষ নন অথবা নবিগণের মতো কোনো পথপ্রদর্শকও নন। বরং তিনি প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার প্রেমিকের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর।

'দিওয়ান' বা কবিতা সংকলনটি 'শামস'-এর নামে, কারণ রুমি ৩,২০০ গজলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তাঁর নামে লিখেছেন এবং বাকিগুলোতে তাঁর নাম নেই (অবশ্য কিছু সংখ্যক ভিন্ন কিছু নামে আছে, যেমন, তাঁর অনুসারী সালাহ আদ-দীন)। ফারসি গজলে একজন কবি প্রচলিত প্রথানুসারে গজল বা কবিতার শেষ লাইনে নিজের নামোল্লেখ করেন। অধিকাংশ কবি; যেমন, সাদি এবং হাফিজ–তাদের ছদ্মনাম বা কলমি-নামে পরিচিত, তাদের ব্যক্তিগত নামে নয়। 'দিওয়ান'-এ দ্রুত চোখ বুলালে কোনো পাঠককে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে যে, শামস স্বয়ং কবিতাগুলো লিখেছেন, কারণ শেষ লাইনগুলোতে তাঁর নামই রয়েছে।

রুমির জীবন ও তাঁর কবিতায় শামসের ভূমিকা সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে ভালো বিশ্লেষণ করেছেন ফ্র্যাঙ্কলিন লুইস। তিনি তাঁর সুলিখিত গ্রন্থ "রুমি : পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট"-এর দীর্ঘ একটি অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে, যা এখানে উদ্ধৃত করার তেমন আবশ্যকতা নেই। তাঁর কাজ ইতিহাস, সাহিত্য এবং ধর্মীয় পটভূমিতে এবং রুমি ও শামসের সাহিত্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্য কোনো উৎস থেকে সহজে পাওয়া যায় এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তা পুনরাবৃত্তি করা নয়; বরং শামসের কথা স্বয়ং তাঁকে দিয়ে বলানো। সেক্ষেত্রে আমাকে শামসের জীবন কাহিনি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে হবে এরপর ফারসিতে লেখা শামসের বক্তব্যের বিবরণ "মাকালাত" অথবা "সংলাপ"-এর দিকে মনোযোগী হতে হবে, যেটিকে আমি তাঁর "আত্মজীবনী" হিসেবে উল্লেখ করছি।

জালালুদ্দীন রুমী ১২০৭ সালের বর্তমান আফগানিস্তানের বলখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বাহা ওয়ালাদ একজন মহান ধর্মপ্রচারক ও শায়েখ ছিলেন। আরবি 'শায়েখ' শব্দের অর্থ 'প্রবীণ' বা বয়োবৃদ্ধ (এর সমার্থক ফারসি শব্দ হচ্ছে 'পির') এবং শিক্ষার অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্য এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুফিবাদ হিসেবে পরিচিত আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার প্রেক্ষাপটে আধ্যাত্মিক নির্দেশ করা মুর্শিদের জন্য এটি সম্মানজনক একটি পদবি। বাহা ওয়ালাদ কুরআন, হাদিস, শরিয়াহ ও ফিকাহ এবং ধর্মতত্ত্বের মতো বহির্বিজ্ঞান এবং সুফিবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতীকী সংলাপ ও আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্বের মতো অন্তর্বিজ্ঞানের শায়খ ছিলেন।

পূর্ব দিক থেকে মোঙ্গলরা যখন ধীরে ধীরে বলখের দিকে এগিয়ে আসছিল বাহা ওয়ালাদ তখন তাঁর পরিবার নিয়ে পশ্চিমের দিকে চলে যান এবং এক পর্যায়ে আনাতোলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, যেখানে তিনি শিক্ষক হিসেবে সকলের শ্রদ্ধাভাজনে পরিণত হন। তাঁর পুত্র জালালুদ্দীন তাঁরই নির্দেশনা অনুসরণ করে বহির্বিজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞান– উভয় ধরনের শিক্ষা অর্জন করেন। ১২৩১ সালে বাহা ওয়ালাদ-এর মৃত্যুর সময়ের মধ্যে রুমি কোনিয়ায় শিক্ষা দান ও ধর্ম প্রচারণার কাজে

নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা বহু লোককে তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে আসে এবং খুব শিগ্‌গিরই তিনি নগরীতে সবচেয়ে পরিচিত শায়খের একজনে পরিণত হন, যদিও তখন তিনি মাত্র বিশোর্ধ্ব বয়সি। ধর্মীয় বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে তাঁকে মানসম্মত সম্বোধন 'মাওলানা' বা 'আমাদের মনিব' হিসেবে ডাকা হতো। এক পর্যায়ে এই সম্বোধন তাঁর নামের সাথে যুক্ত না করেই বলা হতে থাকে, যা রুমি নিজেই উল্লেখ করেছেন। এভাবে তাঁর সাথে সুফিবাদের যে ধারা জড়িত হয়ে পড়ে সেটিকে 'মাওলাওয়ি' বলা হয়, (তুর্কিতে Mevlevi), যার অর্থ 'আমাদের মনিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য')।

১২৪৪ সালের ১১ অক্টোবর তাবরিজের শামস-উদ-দীন কোনিয়ায় আসেন। 'মাওলাওয়ি' তরিকাপন্থিরা এই তারিখটি যথাযথভাবে ধারণ করে রেখেছেন তালিকাটির বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে। তাঁর সম্পর্কে প্রাপ্ত বিবরণী থেকে জানা যায়, তখন তাঁর বয়স ছিল ষাট বছর এবং রুমির বয়স সাঁইত্রিশ বছর। রুমিকে বাজারে দেখে শামস তাঁর কাছে বিখ্যাত সুফি আবু ইয়াজিদ বাস্তামির আধ্যাত্মিক খানকাহ'র অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান। বাস্তামি ঘোষণা করেছিলেন যে, "সকল ঐশ্বর্য আমার! আমার আলখেল্লায় আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই!" শামস বলেন, কারো পক্ষে কী করে এটা বলা সম্ভব, যেখানে স্বয়ং নবি মুহাম্মদ নিজেকে শুধু 'আল্লাহর সেবক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন? এই প্রশ্ন শুনে রুমি একটি অবস্থার (হাল) মধ্যে চলে যান, যাকে অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে তাঁর মধ্যে জ্ঞান ও সচেতনতার যে প্রবাহ আসে, তা তাঁকে নিমগ্ন করে।

রুমির জন্য এটি ছিল প্রথম দর্শনেই প্রেম। তিনি শামসের প্রতি নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নিবেদন করেছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষকতার কর্তব্য এড়িয়ে নিজেকে 'সামা' অর্থাৎ সংগীত ও কাব্য শ্রবণ এবং এর সাথে নৃত্যের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করে ফেলেন। রুমির এই আচরণ ও পরিবর্তন তাঁর অনুসারীদের নিদারুণ ব্যথিত করে। কারণ তাদের কাছে সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন শিক্ষকের এহেন আচরণ ছিল বেমানান, অসংগতিপূর্ণ এবং ভক্তদের অনেকে তাঁর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। কিন্তু রুমি তাদের আপত্তি আমলে নেন না। দুই বছর পর দৃশ্যত রুমির ভক্তদের হিংসা ও শত্রুতার কারণে শামস কোনিয়া ছেড়ে চলে যান। রুমি অনেকটা উন্মাদের মতো হয়ে পড়েন। শামসের অনুসন্ধান করতে পুত্র সুলতান ওয়ালাদকে পাঠান দামেস্কে। সুলতান ওয়ালাদ শেষ পর্যন্ত তাঁকে খুঁজে পান আলেপ্পোয়। তাঁকে কোনিয়ায় ফিরে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করেন এবং তিনি ফিরে আসার পর শামস ও রুমি কয়েক মাস পর্যন্ত একত্রে কাটান। এরপর ১২৪৮ সালে শামস নিরুদ্দেশ হন। তাঁর অন্তর্ধানে রুমি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে যান তাঁর অন্তর্ধানে এবং কয়েক বছর চরম বিপর্যস্ত অবস্থায় কাটিয়ে পুনরায় শামস এর দর্শন লাভের আশা ছেড়ে দেন। 'সামা'র আশ্রয় নেন রুমি এবং এ সময়েই তাঁর মধ্যে বিরাট এক রূপান্তর ঘটে যায়, যা তাঁকে ফারসি ভাষার সবচেয়ে সেরা কবিতে পরিণত করে।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে এবং শামস সম্পর্কে অসংখ্য

কাহিনি আরও অনেক প্রশ্ন সৃষ্টির কারণ হয়ে আছে। মহান ব্যক্তিদের জীবনী রচয়িতা ও পণ্ডিতেরা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে বেশ চেষ্টা করেছেন। যেমন, শামসের কী ঘটল? তা আসলে কেউ জানেন না। বরং পরবর্তী সময়ের একটি তথ্যে জানা যায় যে, রুমির বিদ্বেষপরায়ণ ভক্তরা তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন-এর সঙ্গে যোগসাজশ করে শামসকে হত্যা করেছে। আলাউদ্দিনের কাছ থেকে রুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, বিশেষত শামসের অন্তর্ধানের পর। যারা এই কাহিনিকে বিশ্বাস করেন, তারা কোনিয়ায় শামসের কবর চিহ্নিত করেছেন, যেটি রুমির কবর থেকে খুব দূরে নয়। অন্যেরা শত শত বছর ধরে লোকজন ইরানের খুয়ে নামক স্থানে একটি কবরকে শামসের কবর বলে দাবি করে আসছেন। ইসলামি দুনিয়ার আরও কিছু স্থানে কোনো কোনো সমাধিকে তাঁর দেহাবশেষের শেষ আশ্রয় বলে বিশ্বাস করা হয়; যা থেকে তাঁর প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। লুইস যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, শামসকে হত্যা করা হয়েছে এর পক্ষে কোথাও পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কিন্তু তাঁকে যদি হত্যা না করা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি সহসা চলে গেলেন কেন এবং আর ফিরে আসলেন না কেন? তাঁর নিজের কথা থেকে উদ্দেশ্য নির্ণায়ক কিছু জানার ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। এটা স্পষ্ট যে, প্রেমের আরাধ্য বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নতাকে তিনি আধ্যাত্মিক পরিপক্বতা আনার সর্বোত্তম উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। একাধিক ক্ষেত্রে তিনি এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, রুমিকে ছেড়ে যাওয়াই ভালো, কারণ রুমী তখনো তাঁর নিকট থেকে পুরো সুবিধা নেওয়ার মতো পরিপক্বতা অর্জন করেননি। যেমন, তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে বলেছেন যে, তিনি আলেপ্পোতে চলে গিয়েছিলেন; কারণ বিচ্ছেদ দ্বারা দগ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল রুমির। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন বিচ্ছেদের ফল ছিল সুস্পষ্ট। কারণ রুমি তাঁর নিকট থেকে অনেক বেশি সুবিধা অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন: "এই মিলনের একটি মাত্র দিন আগের মিলনের এক বছরের সমান।"

রুমি হয়তো শামসের ভূমিকার প্রসঙ্গ একটি বিখ্যাত লাইনে উল্লেখ করেছেন, যা ইরানের বিদ্বজ্জনেরা প্রায়ই তাঁর প্রসঙ্গে উচ্চারণ করেন :

> "আমার জীবনের ফল তিনটি শব্দের বেশি নয়
> আমি অপক্ব ছিলাম, আমি সেদ্ধ হই, আমি দগ্ধ হই।"

শামস সম্ভবত রুমিকে এ কারণে ছেড়ে যান যে, তিনি সেদ্ধ হয়েছেন এবং তাঁর দগ্ধ হওয়া প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে রুমির বয়স তখন চল্লিশ বছর, আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জনের উত্তম সময়। আমরা দেখতে পাই, শামস বেশ কবার বলেছেন যে, নবি মুহাম্মদ যখন চল্লিশ বছর বয়সে উন্নীত হন, তখনই কথা বলতে শুরু করেন— যা যিশুখ্রিষ্টের সম্পূর্ণ বিপরীত, যিনি দোলনায় থাকতেই কথা বলেন। শামস এটিকে বিবেচনা করেছেন নবি মুহাম্মদের পরিপূর্ণতা অর্জনের লক্ষণ হিসেবে। এর মাঝেই শামস এক মহাজাগতিক তাৎপর্য দেখতে পেয়েছেন এবং সকল ঘটনায় তা প্রতিভাত হয়েছে। তিনি বলেছেন, তাঁর কোনিয়ায়

আগমনের একমাত্র কারণ ছিল রুমির মাঝে পরিশুদ্ধতা আনা। অতএব আমরা তাঁর অন্তর্ধানকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে, তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছিল বলেই তিনি কোনিয়া ত্যাগ করেন।

তাছাড়া, শামস আমাদেরকে বারবার বলেছেন যে, আল্লাহর সেরা দরবেশরা সবসময় আড়ালে বিরাজ করেছেন এবং তিনি তাঁর আধ্যাত্মিকতা অন্য লোকজন থেকে গোপন রাখার চেষ্টার কথাও বলেছেন। দ্বিতীয়বার কোনিয়া ত্যাগ করার পর সম্ভবত তিনি নিজেকে আড়াল করেই রেখেছিলেন, এমনকি তিনি তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে তিনি এবং রুমি এতটা অবারিত ছিলেন : "আমরা দুজন চমৎকার মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলাম। আমাদের মতো দুজন লোক কত দীর্ঘ সময় পর মিলিত হয়েছি। আমরা সুস্পষ্টভাবেই উন্মুক্ত এবং দৃশ্যমান।"

রুমির ভক্তদের কাছে শামস কেন এতটা শত্রু হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন? প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী আমরা জানতে পারি, রুমীর ভক্ত অনুরক্তরা বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। শামসের আগমনের পূর্বে রুমি তাদের সাথে সময় কাটাতেন, কিন্তু এখন তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় কাটান শামসের সাথে। শামস আসলেও রুমির সঙ্গে প্রচুর সময় ব্যয় করতেন, কিন্তু তাঁর উপদেশমালার অস্তিত্ব থেকেই দেখা যায় তাঁদের দুজনের পক্ষে অন্তত একজন অনেক ক্ষেত্রে বিরাজমান। তাছাড়া এসব বিবরণ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শামস তাঁর বেশিরভাগ সময় শুধু রুমির বৃত্তেই কাটাননি; বরং অন্যান্য সুফি ও শিক্ষিত লোকজনের সঙ্গেও কাটিয়েছেন।

রুমির নিজস্ব সহচরদের সঙ্গে শামসের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ থেকে তা শত্রুতা পর্যন্ত গড়ানোর পেছনে কোনো কারণ থাকলেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি তাঁর অনীহা একটি বড় কারণ ছিল। সেই বলয়ের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ভাব এড়ানোর জন্য তাঁর মধ্যে সহজাত সৌজন্যমূলক আচরণে অভ্যস্ত হওয়ার মতো ধৈর্য তাঁর ছিল না। লোকজন সম্পর্কে তিনি কী ভাবেন তা তাদেরকে খোলামেলা বলে ফেলতেন। তাঁর বিচার-বিবেচনা ছিল অনেকটা রূঢ় এবং সম্ভবত সেটিই তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। অধিকাংশ মানুষই চায় না যে কেউ তাদেরকে মূর্খ, আহাম্মক বলুক; বিশেষ করে তা যদি সরাসরি ও তীক্ষ্ণ ভাষায় বলা হয়, যা শামস বলতেন। তাছাড়া, তিনি একথাও বলতেন যে, তাদের সম্পর্কে আসলেই তিনি যা ভাবেন তা বলা থেকে বিরত রয়েছেন। তিনি যদি তাঁর মনের কথা বলতেন তাহলে তারা তাঁকে কোনিয়া থেকে বিতাড়ন করত। তাঁর একটি লেখায় তিনি উল্লেখ করেছেন, "আমি যদি সত্য বলতাম, তাহলে এই মাদ্রাসার সবাই আমার জীবনের পেছনে লাগত, কিন্তু তোমরা কোনোকিছু করতে সক্ষম নও। এই ক্ষতি তোমাদের কাছেই ফিরে আসবে। তোমরা চাইলে চেষ্টা করতে পারো।"

পরবর্তী সময়ের সাহিত্যে শামস সম্পর্কে যেসব কাহিনি ও কথা বলা হয়েছে সেগুলোতে প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁকে আধ্যাত্মিকতার প্রতিভাহীন, কেতাবি শিক্ষার প্রতি বিরাগভাজন এবং ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ হিসেবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে পাঠ ও আলোচনায় দেখা যায়, এসব অভিযোগের

কোনো ভিত্তি নেই। বাস্তবে শামস কুরআন পুরোটাই মুখস্থ করেছিলেন এবং শিক্ষকতা করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি 'ফিকাহ' বা ইসলামি শরিয়াহর ওপর শিক্ষা গ্রহণ করেন, এমনকি কোনিয়ায় তাঁর সময় অতিবাহিত করেছেন ইসলামি আইনবিদদের সাহচর্যে। শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনেরা কী বলেন তা শেখার জন্য তিনি তাদের সাথে বসতেন। দর্শনের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয়, যদিও দর্শন চর্চাকারীদের অনেককে তিনি তিরস্কার করতেন। এটা নিশ্চিত যে, যারা নামেমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং উলেমারা পাণ্ডিত্যের যে ভান করতেন; অর্থাৎ এ ধরনের ব্যক্তি, যারা মসজিদ ও মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রদান করতেন, তাদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর দৃষ্টিতে এ ধরনের লোকজন তাদের পদ ও সম্মানের সাথে বেইমানি ও প্রতারণা করছেন; কারণ তারা আল্লাহকে অন্বেষণের পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষাকে জীবিকা অর্জনের কাজে লাগাচ্ছে।

শামস ও রুমি উভয়ের মতে জ্ঞানার্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর পথ অনুসন্ধান করা, যিনি নিরঙ্কুশ ও প্রকৃত সত্য (হক)। ছাত্র ও জ্ঞান অন্বেষণকারীদের উচিত উপলব্ধি (তাহক্বিক) লাভ, যা একজনকে আল্লাহর বাস্তবতা জানতে এবং কোনো বস্তু বাস্তবে ও সত্যিকার অর্থে কেমন ঠিক সেভাবে বুঝতে সহায়তা করবে। যারা নিজেদের হৃদয় দিয়ে সত্য আবিষ্কার না করে শুধু অন্যের কথা মুখস্থ করে শামস প্রায়শই তাদের সমালোচনা করতেন। আল্লাহর পথে যদিও এ ধরনের অনুকরণ (তাক্বলিদ) প্রথম পর্যায়ে আবশ্যক, কিন্তু তা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেকে জানতে পারে অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহকে মুখোমুখি দেখতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা শুধু সহায়ক উপকরণ। তাদেরকে অবশ্যই এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হতে হবে, যেখানে তারা এই সহায়ক উপকরণটি ছুড়ে ফেলে দেবে, কিন্তু তা এজন্য নয় যে, অনুকরণ করে জ্ঞানের সত্য সম্পর্কে তারা যে শিক্ষা অর্জন করেছেন, তা অস্বীকার করে নয়; বরং তাদের নিজেদের মধ্যে সত্য খুঁজে বের করার মাধ্যমে। যতদিন পর্যন্ত তাদের কোনো সহায়ক উপকরণের প্রয়োজন পড়বে, ততদিন পর্যন্ত তারা কোন বস্তু সত্যিকার অর্থে কেমন তা জানতে পারবেন না। তারা নবির নিবেদনের উত্তর এখনো পায়নি, যা তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ, কোন বস্তু কেমন, তা ঠিক সেভাবে আমাদেরকে প্রদর্শন করো।"

রুমি কী কারণে শামসকে কার্যত একটি ঐশ্বরিক মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন? শামসের মাঝে তিনি কী দেখেছিলেন? এর একটি সাধারণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় প্রেমিক-প্রেমিকা লায়লা ও মজনুর কাহিনি থেকে। শুধু মজনুর দৃষ্টি ছিল লায়লার সৌন্দর্য দেখার। রুমি শুধু তাঁর চোখে শামসের মাঝে আধ্যাত্মিক সত্তা দেখতে পেয়েছিলেন। উপদেশ বা সংলাপ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, রুমি যে একাই শামসের ঐশ্বরিক আবহ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন তা নয়, স্বয়ং শামস আমাদের বারবার তাঁর মহিমান্বিত মর্যাদার কথা বলেছেন এবং তা এমনভাবে বলেছেন, যাতে আমরা ধারণা করতে পারি যে তাঁর ব্যবহৃত শব্দের পেছনে কী ছিল; যদিও সেসব শব্দ যারা

শুনেছে তাদের অধিকাংশই সেসবের কদর্থ করেছে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, রুমির মতো একজন তীক্ষ্ণ ও ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী সহচরকে আহাম্মকে পরিণত করা সহজ নয়।

সংক্ষেপে, 'সংলাপ'-এর অসংখ্য বিবরণীতে অনেক প্রশ্নের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, যেসব প্রশ্নের কারণে রুমি ও শামস সম্পর্কে বহু শতাব্দী ধরে প্রশ্ন করা হচ্ছে। ভূমিকায় এত বিশ্লেষণ করার সুযোগ নেই। শামসের আত্মজীবনী গ্রন্থিত করার প্রয়াস সুনির্দিষ্ট কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য নয়; বরং এমন এক ব্যক্তিত্বের কাছে তুলনামূলকভাবে সরাসরি পৌঁছার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, যার মহত্ত্ব রুমির নিজের জীবনকে উন্মুক্ত করেছে। পাঠকরাই বিচার করবেন যে, শামস আসলেই তাঁর কাহিনিতুল্য মর্যাদা লাভের যোগ্য কি না। তবে এটা নিশ্চিত যে তাঁর শব্দরাজি কাউকে হতাশ করবে না।

একটি ঐতিহাসিক বিষয়ের ওপর আমার কিছু বলা আবশ্যক; তা হলো, শামসের সমসাময়িক বিখ্যাত এক ব্যক্তি মহীউদ্দিন ইবন-আরাবি (আবু আবদ আল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আরাবি আল-হাতিমি আত তাঈ। জীবৎকাল : ১১৬৫-১২৪০), যাঁর লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত। এই মহান ব্যক্তি ১২৪০ সালে দামেস্কে মারা যান। শামস তাঁর "সংলাপ" এ তাঁর পরিচিত দুজন ব্যক্তির (রুমি ছাড়া) প্রসঙ্গ অন্য কারও চাইতে বেশি উল্লেখ করেছেন। একজনের নাম শিহাব হারিওয়া, যাঁকে তিনি শিহাব নিশাবুরি বলেছেন। সম্ভবত তিনি শিহাব উদ্দীন নিশাবুরি, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ফখরুদ্দীন রাজি'র (ফখর আল-দীন আল-রাজির জন্ম ইরানে এবং মৃত্যুবরণ করেন আফগানিস্তানের হিরাতে। চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য, ইতিহাস ও আইনের ওপর তাঁর অনেক রচনা রয়েছে। জীবৎকাল : ১১৫০-১২০৯) ব্যতিক্রমী মেধাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। শামস অনেক ক্ষেত্রে ফখরুদ্দীন রাজি'র নামও উল্লেখ করেছেন। হারিওয়ার অর্থ 'হিরাত থেকে' এবং ফখরুদ্দীন রাজি তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি বছর ওই নগরীতে শিক্ষকতা করেন। হিরাত থেকে প্রায় দুশো মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে নিশাপুর অবস্থিত। শিহাব সম্ভবত সেখানে বেড়ে ওঠেন। কারণ শামস উল্লেখ করেছেন যে, শিহাব ওই নগরীর উচ্চারণে কথা বলতেন।

শামস দামেস্কে শিহাবের সঙ্গে আলোচনার আসরে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বিবরণ দিয়েছেন। তিনি তাঁকে একজন দার্শনিক বলে বিবেচনা করতেন; পাশাপাশি তাঁর অনেক শিক্ষার সমালোচনাও করেছেন। তিনি বলেছেন বড় বড় সব পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। কিন্তু ওই সময়ের সবচেয়ে খ্যাতিমান দার্শনিককেও তিনি কোনো গুরুত্ব দেননি। একটি কাহিনিতে তাঁকে শিয়া মতাবলম্বী বলা হয়েছে। আরেকটি কাহিনি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর বন্ধু শায়েখ মুহাম্মদ তাঁকে স্বপ্নে দেখেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে, এই স্বপ্নের অর্থ হলো তিনি মারা গেছেন। সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখতে পান যে, তিনি তাঁর বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন।

শায়েখ মুহাম্মদ দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাঁর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রসঙ্গে এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, "ইবনে আরাবি এখন দামেস্কে।" এটা আশা করা যৌক্তিক যে, শামস যদি নগরীর পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে থাকতেন তাহলে অবশ্যই ইবনে আরাবির সাহচর্যেও এসেছেন। কারণ তিনি ওই সময়ে একজন বিখ্যাত সুফি ও বিদ্বজ্জন ছিলেন। শায়েখ মুহাম্মদকে শামস বলতেন "একটি পর্বত" যা পরবর্তী সময়ে ইবনে আরাবিকে "সেরা শিক্ষক" পদবিতে ভূষিত করেছে। এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, আসলে তিনিই ছিলেন বিখ্যাত "ইবনে আরাবি"। আমাদের স্মরণ করা উচিত, তাঁর সময়ে তিনি খুব খ্যাতির অধিকারী ছিলেন না এবং আলেকজান্ডার কেনউইশ-এর মতো ব্যক্তিত্ব ছাড়াও তাঁর সময়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিতও তাঁর সম্পর্কে অসচেতন ছিলেন। শামসের কর্মের ফারসি ভাষার সংকলক মোহাম্মদ আলী মোবাহহেদ অনেকটাই নিশ্চিত যে, শায়েখ মুহাম্মদ এবং ইবনে আরাবি একই ব্যক্তি ছিলেন এবং ওমিদ সাফি তাঁর এক নিবন্ধে মোবাহহেদের যুক্তির সমর্থন করেছেন। ফ্র্যাঙ্কলিন লুইস এ সম্পর্কে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেও বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, মোবাহহেদ-এর যুক্তিই সঠিক।" মোবাহহেদ যে শায়েখ মুহাম্মদকে ইবনে আরাবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিস্তারিত দলিল উপস্থাপন করেছেন, তা আমার এই গ্রন্থের তথ্যেরও গুরুত্ব বৃদ্ধি করবে। তবে প্রাথমিক সময়ে মৌলবিদের বৈশিষ্ট্য ইবনে আরাবির মধ্যে থাকায় অনেকেই তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণা দেখিয়েছেন। সেজন্য শামস আমাদেরকে বলেছেন, শায়েখ মুহাম্মদ যদিও একটি পর্বত, কিন্তু মাওলানা'র (রুমি) পাশে তিনি 'মুক্তার পাশে নুড়িপাথরের মতো।' মাওলানার অনেক ভক্ত শামস অর্থাৎ রুমির ওস্তাদের নিকট থেকে একথা শুনে আনন্দিত হয়েছেন যে, এই গুরুত্বহীন নুড়িপাথর হচ্ছেন 'মহান' ইবনে আরাবি।

শায়েখ মুহাম্মদের সঙ্গে অনেক আলোচনার কথা শামস স্মরণ করেছেন এবং যে বক্তব্যগুলোর উদ্ধৃতি তিনি দিতেন তা থেকে সহজেই বলা সম্ভব হতো কথাগুলো ইবনে আরাবির; যদিও এসব কথা আরও অনেকেই বলে থাকতে পারেন। শামসের অন্যান্য বক্তব্য তেমনভাবে ইবনে আরাবির বক্তব্য বলে বোঝা যেত না, যা আমরা তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি। শামস তাঁর বর্ণনায় যে প্রমাণ রেখে গেছেন তা থেকে আমাদের পক্ষে উপসংহারে পৌঁছা সম্ভব নয়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, "শায়েখ মুহাম্মদ কে হতে পারেন? ইবনে আরাবি ছাড়া দামেস্কে আর কোন 'পবর্ত' ছিল?" শামসের উপদেশাবলি বা সংলাপের ভিত্তিতে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, শিহাব হারিওয়াকে শামস প্রায় শায়েখ মুহাম্মদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাহলে কে এই শিহাব হারিওয়া? তিনি তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক দিশা সামান্যই রেখে গেছেন, যদিও শামসের দৃষ্টিতে তিনি তখনকার সবচেয়ে সেরা চিন্তাবিদ ছিলেন। তাছাড়া, ১২৩০-এর দশকে দামেস্কে কয়জন শায়েখ মুহাম্মদ ছিলেন? যদি ধরেও নেওয়া যায় যে বিশ্বে 'মুহাম্মদ' সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের অভিন্ন 'প্রথম নাম'; তা সত্ত্বেও নিশ্চিতভাবেই বলা যায় শায়েখ মুহাম্মদ খুব বেশি সংখ্যক মানুষের নাম হবে না।

আমরা অনেকে তাৎক্ষণিকভাবে ভাবতে পারি যে, ইবনে আরাবি শামসের বর্ণিত শায়েখ মুহাম্মদ হতে পারেন না।

শামসের দৃষ্টিতে মহত্ত্বের লক্ষণ কী? তিনি বারবার বলেছেন যে, বড় বড় দরবেশরা থাকেন অন্তরালে এবং রুমির ভূমিকাকে তিনি প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন। একটি বর্ণনায় তিনি মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর নিজ নগরী তাবরিজের অনেক মানুষের কাছে তিনি কিছুই ছিলেন না; "সেখানে যারা ছিল তাদের কাছে আমি ছিলাম নগণ্য। তারা আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে; আমি ভাসতে ভাসতে সমুদ্রের তীরে উপনীত হয়েছি। আমি যদি এমন একজন মানুষ হই– তাহলে তারা কেমন?"

রুমির সাহিত্য ও অনুবাদ

রুমির পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্যের মধ্যে 'উপদেশাবলি' বা 'সংলাপ'-এর অস্তিত্ব দীর্ঘদিন থেকে স্বীকৃত। যদিও বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি ছিল তুরস্কে এবং সেগুলো বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় জুড়ে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল এবং বিশেষ করে এগুলোর পাঠোদ্ধার করা ছিল কঠিন। ১৯৭০ সালে একটি খণ্ডিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় তেহরানে এবং মোহাম্মদ আলী মোবাহহেদের বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৭৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত একই নগরীতে একটি সুগ্রন্থিত সংস্করণ প্রকাশিত হতে পারেনি। এটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত। পাশ্চাত্যের গবেষকদের মধ্যে শুধু লুইস রুমির 'সংলাপ'কে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। শামস সম্পর্কিত অধ্যায়ে তিনি বিবরণীতে উল্লেখকৃত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কিছু সংক্ষিপ্ত অধ্যায় অনুবাদ করে শামস ও রুমির মধ্যে সম্পর্কের ওপরও আলোকপাত করেছেন। এর ওপর আরও গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। ইতোমধ্যে যা গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় 'সংলাপ' কোনো সাধারণ গ্রন্থ নয়। ফারসি ভাষার বিবরণী মুদ্রণজনিত কারণে পাঠোদ্ধার করা একটু কঠিন হলেও গবেষকরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।

রুমির 'সংলাপ' সম্পর্কে আমাদেরকে প্রথমেই যে বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন তা হলো, এটি শামস রচনা করেননি; বরং যখন শামস রুমির উপস্থিতিতে কথা বলতেন রুমির ঘনিষ্ঠ মহলের এক বা একাধিক ব্যক্তি এই কাজটি করেছেন। এই আলাপচারিতার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা হয়েছে; কিন্তু সেগুলো কখনো চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য সম্পাদনা করা হয়নি। অতএব, ধরে নেওয়া যায় যে সেগুলো অগোছালোভাবে গৃহীত নোট হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে।

জে আরবেরি রুমির 'ফিহি মা ফিহি' অনুবাদ করেছেন 'রুমির সংলাপ' হিসেবে, যা অনেকটা অসম্পাদিত বিবরণীর মতো। এটি রুমির এক বা একাধিক শ্রোতা কর্তৃক ধারণকৃত তার কথামালার সংগ্রহ। এরপর এগুলো সম্পাদনা করা হয় এবং পরিষ্কারভাবে লেখা হয়। এমন হওয়াই স্বাভাবিক যে, গুছিয়ে লেখার পর তা রুমিকে দেখানো হয়েছে, এরপর তিনি এগুলো মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য

অনুমোদন করেছেন। 'শামসের সংলাপ'-এর ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত যে, তিনি কখনো তার বিবরণীর চূড়ান্ত রূপ দেখেননি, অথবা তিনি তা করে থাকলেও সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি শুরুর দিকের একটি অংশের গুছিয়ে লেখা কপি দেখে থাকতে থাকতে পারেন। তা শুধু অনুমান। মোবাহহেদ বলেছেন যে, ছয়টি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি দেখে 'শামসের সংলাপ'-এর দুটি খণ্ড তৈরি করা হয়েছে। তৃতীয়টি দীর্ঘ এবং সম্পূর্ণ অসম্পাদিত সংগ্রহ। সংক্ষিপ্ত খণ্ডের পুরোনো বিবরণী রুমির পুত্র সুলতান ওয়ালাদ-এর হাতে পড়েছিল, তা অনেকটা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে। কারণ সুলতান ওয়ালাদ তাঁর গ্রন্থে শামসের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা উল্লেখ করেছেন। মোবাহহেদ মনে করেন যে, শামস তাঁর 'সংলাপ'-এর সংক্ষিপ্ত অংশ দেখে থাকবেন এবং হয়তো অনুমোদনও করেছেন, যদিও এই বিবরণী কখনো সম্পূর্ণ হয়নি। তার মতে, খুব গুছিয়ে লেখা যে বিবরণী রয়েছে সেগুলো হয়তো শামস নির্দেশনা দিয়েছেন, শুধু তাঁর আলোচনা থেকে কেউ লিখে নিয়েছে, এমন নয়।

মোবাহহেদ ছয়টি পুরোনো পাণ্ডলিপি, কয়েকটি নতুন পাণ্ডলিপি এবং আরও বিভিন্ন গ্রন্থ যেগুলোতে শামসের উদ্ধৃতি রয়েছে, সেসব নিয়ে বহু বছর পর্যন্ত পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু 'সংলাপ' এখনো গল্প, কাহিনি এবং কিছু কিছু উপদেশ, যেগুলোর দৈর্ঘ্য একটি বাক্য থেকে চারটি বাক্য অথবা পাঁচ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হলেও এখন পর্যন্ত সেটি অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ সংগ্রহ। মোবাহহেদ স্বীকার করেছেন যে, তিনি তার সম্পাদিত 'সংলাপ' দীর্ঘ বিবরণী থেকে পর্যায়ক্রমে ছোট বিবরণীর ক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। অনেক বিবরণী সঠিকভাবে লেখা ছিল না এবং অনেকগুলোর পাঠোদ্ধার করা দুরূহ ছিল। এতটা দুরূহ হওয়ার কারণ ছিল যে শামস বিস্ময়করভাবে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছেন; এমনকি তিনি কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, সুফিবাদ, দর্শন এবং ধর্মতত্ত্বের মতো বিষয়ের ভাষা ব্যবহারেও আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন। আনুষ্ঠানিক লেখার বিপরীতে তাঁর বিবরণীতে ব্যাকরণগত সমস্যা রয়েছে, যাকে সুস্পষ্টভাবেই ভুল বলা চলে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অনেক বিবরণী খুবই ছোট অথবা কোনো প্রসঙ্গ নেই। প্রায়ই বুঝতে সমস্যা হয় যে, শামস কোন প্রশ্ন বা বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। একদিকে কথা বলার আঞ্চলিক ধরন, অনেক সময় হাস্যকর ভাষা ব্যবহারের কারণে ধারণা করা কঠিন হয়ে ওঠে যে, তিনি কী বলতে চেয়েছেন। তিনি আকারে-ইঙ্গিতে ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলতে ভালোবাসতেন এবং তাতে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইঙ্গিতও থাকত এবং কেউ জানে না যে, শামস কোন অবস্থান থেকে তাঁর কথা কোন অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছেন এবং যিনি তাঁর কথা টুকে নিচ্ছেন হয়তো তাঁর পক্ষে তাল মিলানো সম্ভব হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানো যায়, কোনো একটি বিবরণীর দুটি বাক্য ধারণের মধ্যে হয়তো অনেক মিনিট ব্যয় হয়েছে অথবা এমন হতে পারে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন লেগে গেছে।

সম্পাদক শামস-ই-তাবরিজী'র বিবরণীকে যতিচিহ্ন, প্যারাগ্রাফ এবং অন্য রীতিতে সাজিয়েছেন, যা প্রাক-আধুনিক ফারসিতে অজ্ঞাত। অনেক সংলাপের মধ্যে

সবচেয়ে কঠিন একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন যে, আসলে কে, কার সাথে কথা বলছেন। কোনো কোনো বিবরণে দেখা যাবে, "তিনি বলেছেন" আবার কোনো কোনোটিতে "আমি বলেছি।" সাধারণভাবে এমন মনে হয় যে, শামস কথা বলছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এমনকি প্রথম পুরুষের সর্বনামে কাউকে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে দুজন বক্তাকে "তিনি" বলা হয়েছে, যার একজনকে মনে হয় শামসের শ্রোতা। কিন্তু সবসময় তা স্পষ্ট নয় যে, কে কোনটি? বর্ণনায় প্রায়শই সম্বোধন করা হয়েছে, "তুমি" এবং এটি রুমি অথবা রুমি নাও হতে পারেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শামস স্পষ্টভাবে রুমি ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেছেন। কারো পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় যে, শ্রোতা হিসেবে যখন রুমিকে উল্লেখ করা হয়েছে, বাস্তবে তা রুমিকে সম্বোধন করা হয়েছিল কি না। একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, ফারসি ভাষায় এই 'সংলাপ'-এর সম্পাদক মোবাহহেদ বলেছেন যে, পাণ্ডুলিপিতে সাধারণভাবে প্রকৃত নামের পরিবর্তে স্বাক্ষর ধরনে লেখা রয়েছে। এর ফলে এটাও ধারণা করা যেতে পারে যে, সম্পাদক অনেক বিবরণীর সঠিক পাঠোদ্ধার করতে পারেননি অথবা ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

'সংলাপ'-এর বিবরণ ও পাঠোদ্ধারজনিত সমস্যা ছাড়াও রুমি ও শামসের পাঠকরা স্বীকার করেন যে, মোবাহহেদের সংস্করণ রুমী চর্চাকারী ছাত্র ও ভক্তদের জন্য বিরাট এক অবদান। প্রথমবারের মতো আমরা শামসের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি তার মাধ্যমে। এটি শুধু যথার্থতার আলো ছড়িয়ে দেয়নি; বরং প্রেমের আগুন জ্বালিয়েছে, যা রুমীর কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত। শামস ছাড়া আর কোনো খ্যাতিমান এসব বিষয় সম্পর্কে বলতে পারতেন না– কারণ কোনো কোনো প্রসঙ্গ অত্যন্ত উদ্ভট, বিদঘুটে। এসবের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অপ্রাসঙ্গিক। কারণ এগুলো স্বয়ং শব্দ দ্বারাই প্রমাণিত, শুধু পাণ্ডুলিপির উৎস দ্বারা নয়। 'সংলাপ' এ শামস-ই-তাবরিজী' নিজের কথা বলছেন এবং বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলছেন। যারা রুমির প্রশংসা করেন অথবা সুফিবাদের প্রতি ঝোঁক আছে তাদের প্রত্যেকের উচিত শামসের সংলাপ বা উপদেশাবলি পাঠ করা। অন্য কেউ যদি 'সংলাপ'-এর লেখক হতেন, আমি তা অনুবাদ করতে পারলেই বেশি আনন্দিত হতাম।

আমি ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুবাদে হাত দেই এবং প্রথমে আমার স্বচ্ছ ধারণা ছিল না যে, আমার কাজ সম্পূর্ণ হলে আমি এটা দিয়ে কী করব। কিছুসময়ের জন্য আমি ভেবেছিলাম আমি হয়তো একটি বা দুটি নিবন্ধ লিখব অথবা তাঁর শিক্ষার ওপর সংক্ষিপ্ত এই বই রচনা করব। প্রথমে আমার মনে হয়নি যে, একটি সারগর্ভ গ্রন্থ তৈরির মতো পর্যাপ্ত সুসমন্বিত উপাদান পাওয়া যাবে না। ক্রমে আমি বিবরণীর ধরন ও এর অন্তর্নিহিত গঠন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হই। আমি দুটি খণ্ডই মনোযোগ দিয়ে পাঠ করি এবং অভিভূত হয়ে যে অংশগুলো বেশি আকর্ষণীয় সেগুলোর প্রতিটি অনুবাদ করি। বিবরণীর কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করার চেষ্টা করিনি, কারণ আমি সেগুলো পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারিনি। অন্যগুলো যখন শুরু করি, তখনো মাঝামাঝি অবস্থায় এসে থেমে যাই, কারণ আমার মনে হয় যে সামনে